প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশের ইতিহাস

১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ও ভারত দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান আমলের পুরো সময়টিতে এদেশের মানুষ নানাভাবে বঞ্চনা আর নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাই অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে। তারই ফসল আমাদের এই বাংলাদেশ। বহু মানুষের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা। জাতি অর্জন করেছে বিজয়। ইতিহাসে আমরা পরিচিত হয়েছি বীর বাঙালি ও বিজয়ী জাতি হিসাবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে মানব বসতির ধারা বর্ণনা করতে পারব;
- রাজনৈতিক ইতিহাসের যুগ বিভাজন করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন বর্ণনা করতে পারব;
- মধ্যযুগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- আধুনিক যুগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- দেশটির জন্মকথা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গর্ববোধ করব।

পাঠ- ১ ও ২: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। সে বছর ২৫শে মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মার্চ থেকে ডিসেম্বর-এই নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসররা এদেশে লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। আর বাঙালি ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানি হানাদারদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করেছি। কিন্তু এত বড় ঘটনা তো হঠাৎ করে শুরু হয়নি। স্বাভাবিকভাবে এরও একটি পটভূমি ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দেশটি ছিল দুইটি অংশে বিভক্ত-পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। দুইটি অংশের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান। মাঝখানে অন্য একটি দেশ ভারত। পাকিস্তানের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, ক্ষমতাও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদেরই হাতে। অনেক আন্দোলন, সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশদের কাছ থেকে অর্জিত স্বাধীনতা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানিরা স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানিরা তখন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানি অর্থাৎ বাঙালিদের উপর বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনা শুরু করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তানিরা প্রথম আক্রমণ করল বাঙালিদের সংস্কৃতি অর্থাৎ মাতৃভাষা বাংলার উপর। তারপর রাজনৈতিক অধিকারের উপর। একতরফা ক্ষমতা ভোগ করে পাকিস্তানি শাসকরা আঘাত হানল আমাদের অর্থনীতির উপর। পাশাপাশি চলল বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কুৎসা আর তা ধ্বংসের প্রয়াস। এ অবস্থায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর সাহসী, ত্যাগী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাঙালি স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ আমল থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন। ছয় দফা দাবি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দাবিগুলো তিনি সামনে নিয়ে আসেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে দেয়া তাঁর কালজয়ী বক্তব্য বাঙালিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে। উজ্জীবিত জাতি ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে বিজয়ী করে। কিন্তু সামরিক সরকার এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন এ দেশের রাজনীতিবিদ, ছাত্র-জনতাসহ আপামর জনসাধারণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আপোশহীন অবস্থান নেয়।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও আমাদের বিজয়

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ গভীর রাতে ভারী অস্ত্র আর ট্যাংকবহর নিয়ে এ দেশের ঘুমন্ত মানুষের উপর পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে একটি বার্তা সারা দেশে পাঠিয়ে দেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। তখন বাঙালি পুলিশ, ইপিআর সদস্য, সেনা ও জনতা দ্রুত সংগঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। এদেশের পুলিশ-ইপিআর সদস্য-কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতাসহ সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অনেক দেশ এই দুঃসময়ে আমাদের পাশে দাঁড়ায়। এক কোটিরও বেশি মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালি শরণার্থীদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি শহিদ হন। অসংখ্য ঘরবাড়ি, জনপদ, লোকালয়, গ্রাম-শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অনেক রক্ত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছি। এ দিনটি আমরা বিজয়দিবস হিসাবে পালন করি। সেদিন তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

২৫শে মার্চ কালরাত্রির গণহত্যা

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করল। তাই বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির পিতা এবং বাংলাদেশের স্থপতি।

স্বাধীনতার একদিকে রয়েছে অনেক হারানোর বেদনা, অন্যদিকে বিশাল প্রাপ্তির আনন্দ। রক্তেভেজা স্বাধীনতার লালসূর্য আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে শ্যামলসুন্দর দেশের উপর।

কাজ-১ : মুক্তিযুদ্ধের কারণগুলো শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করে ক্রমানুসারে সাজাও।
কাজ-২ : মুক্তিযুদ্ধে কেন আমরা বিজয়ী হয়েছি তা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করে ক্রমানুসারে সাজাও।
কাজ-৩ : মুক্তিযুদ্ধের ছবি সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম তৈরি কর।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে যে দেশের জন্ম হলো তার ইতিহাস কিন্তু অনেক প্রাচীন এবং এর পিছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। আমরা পরবর্তী পাঠগুলোতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাংলাদেশের মানব বসতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থার উত্থান-পতন ও ফলাফল সম্পর্কে জানব।

পাঠ- ৩, ৪ ও ৫ : বাংলাদেশে মানব বসতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে মানব বসতি ছিল। বর্তমান কালের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে তা প্রমাণ হয়েছে। সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলার কোনো কোনো অঞ্চল বাংলাদেশের প্রাচীনতম ভূমি। রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল ও নরসিংদী জেলার কিছু অঞ্চলও বেশ প্রাচীন। চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, সীতাকুণ্ড, কুমিল্লার লালমাই, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতিয়ার যেমন- পাথর ও কাঠের হাতকুঠার, বাটালি, তীরের ফলক প্রভৃতি আবিষ্কার হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগকেই অনেকে প্রস্তর যুগ বলে। প্রস্তর যুগের মানুষ বনে-বাদাড়ে ঘুরে যাযাবরের মতো জীবনযাপন করেছে। পশু-পাখি ও মৎস্য শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ করে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করেছে।

প্রস্তর যুগের পর নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে তাম্র-প্রস্তর যুগের গর্ত-বসতির চিহ্ন আবিষ্কার হয়েছে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় প্রস্তর যুগ ও তাম্র-প্রস্তর যুগের মানব বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। বর্তমান পাকিস্তানের হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও ভারতের লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি প্রত্নস্থানে সিন্ধু (হরপ্পা) নগর সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০০-১৭০০ অব্দ) ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা।

ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার কোনো চিহ্ন বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। তবে ভারত উপমহাদেশের দ্বিতীয় নগর সভ্যতার নিদর্শন বগুড়ার বরেন্দ্র ভূমি মহাস্থানগড়ে এবং নরসিংদীর মধুপুর ভূমি উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কার হয়েছে। মহাস্থানগড়ে অবস্থিত প্রাচীন নগরটির নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পুণ্ড্রনগর গড়ে উঠেছিল। উয়ারী-বটেশ্বরে অবস্থিত আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন নগরটির নাম এখনও জানা যায়নি। সমসাময়িক কালে ভারত উপমহাদেশের ১৬টি বিখ্যাত জনপদের নাম জানা যায়। এই জনপদগুলো ছিল এক একটি পৃথক রাষ্ট্র। ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য জনপদগুলোর মৌর্য যুগ-পূর্ব রাজনৈতিক ইতিহাস অল্পবিস্তর জানা যায়। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ অংশের ইতিহাস মৌর্য যুগের সম্রাট অশোকের সময় থেকে জানা যায়।

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে অনুমান করা হয় মৌর্য সম্রাট অশোক পুণ্ড্রনগর শাসন করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন চট্টগ্রাম পর্যন্ত মৌর্য শাসনাধীন ছিল। মৌর্য যুগের পর ভারত উপমহাদেশের অনেক অঞ্চলে শুঙ্গ ও কুষাণ রাজাদের শাসন ছিল। বাংলাদেশ অঞ্চলে শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের কিছু পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু শাসন বিস্তারের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

শশাঙ্ক

আমাদের দেশের বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায় গুপ্ত যুগ থেকে। গুপ্তরা মূলত ভারত উপমহাদেশের উত্তর অঞ্চলের শাসক ছিলেন। বাংলাদেশের উত্তরাংশে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি নামে একটি প্রদেশ গুপ্তদের শাসনাভুক্ত ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের বাংলাদেশ প্রাচীনকালে একক কোনো দেশ ছিল না। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল তখন পুণ্ড্রবর্ধন, বঙ্গ, সমতট, গৌড়, বরেন্দ্র, হরিকেল প্রভৃতি জনপদ নামে পরিচিত ছিল।

গুপ্ত শাসনের শেষের দিকে বাংলাদেশ অঞ্চলের আরও কিছু রাজার নাম পাওয়া যায়, যারা 'পরবর্তী গুপ্ত' নামে পরিচিত। পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের পর সপ্তম শতকে শশাঙ্ক নামে এক শাসকের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গৌড়ের শাসক ছিলেন। তাঁকে গৌড়ের প্রথম স্বাধীন শাসক বলা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর প্রাচীন বাংলাদেশের কোনো স্থায়ী শাসকের তথ্য পাওয়া যায় না। স্থায়ী শাসকের অভাবে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করে। ছোট রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

পাল রাজবংশ (৭৫০-১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

পাল রাজবংশ বাংলাদেশের প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল শতবর্ষ ব্যাপী কলহ, নৈরাজ্য ও হানাহানির অবসান ঘটিয়ে বরেন্দ্র (গৌড়)-এর সিংহাসনে বসেন। কথিত আছে যে, প্রজাদের প্রতিনিধি বা কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা গোপালকে নির্বাচন করে। অপর একটি মত আছে যে, সামন্তরা গোপালকে ক্ষমতায় বসায়। গোপাল যোগ্য শাসকের পরিচয় দেন। ধর্মপাল, দেবপালও এ বংশের বিখ্যাত শাসক ছিলেন। পালবংশের প্রায় ৪০০ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প ও শিল্পকলাসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জন করে।

দীর্ঘ ৪০০ বছরের পাল শাসকদের অনেকেই দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে শাসন পরিচালনা করলেও কেউ কেউ তা পারেনি। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল-এর সময় দিব্য এর নেতৃত্বে কৈবর্ত নামে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ সফল বিদ্রোহ করে মহীপালকে পরাজিত করে। কিন্তু কৈবর্তদের রাজত্ব ছিল স্বল্পস্থায়ী। মহীপালের ভাই রামপাল সামন্তদের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে কৈবর্ত শাসক ভীমকে এক ভয়াবহ যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে ১০৮২ খ্রিষ্টাব্দে বরেন্দ্র অঞ্চলে পাল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

পাল শাসকদের সমসাময়িক সমতট (প্রধানত কুমিল্লা ও বিক্রমপুর) জনপদে খড়্গ, দেব, চন্দ্র ও বর্ম রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে। সপ্তম শতকে চীনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতট পরিভ্রমণ করে ৩০টি বৌদ্ধবিহার দেখতে পান। সমতটের বজ্রযোগিনীর সন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি একাদশ শতকে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে সেদেশে যান বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় রোধের জন্য।

সেন রাজবংশ (১০৯৮-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)

সেনরা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে পালদের অধীনে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার জন্য এদেশে এসেছিল। ধীরে ধীরে তারা নিজেদের শক্তি বাড়াতে থাকে। শেষ দুর্বল পাল রাজা মদনপালের রাজত্বকালে বিজয় সেন ক্ষমতায় আসেন। বিজয় সেনের পরে রাজা ছিলেন বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন। বলা হয়ে থাকে সেনরা প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘদিন শাসন পরিচালনা করেন। সেনদের মধ্যে বিজয় সেন এবং বল্লাল সেন শৈব সম্প্রদায়ের ছিলেন। লক্ষণ সেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুরাগী ছিলেন। সেনরা ধর্ম-কর্মের বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। লক্ষণ সেনের কাছ থেকে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি নদীয়া বিজয় করেন। তবে লক্ষণ সেনের পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন আরও কিছু সময় (১২০৫-১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) বিক্রমপুরে থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য অংশ শাসন করেন। বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের ফলে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শাসন বিস্তার লাভ করে।

মৌর্য আমল থেকে সেন আমল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীনযুগ বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

কাজ- ১ : প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নস্থানগুলো ও প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত উপকরণগুলোর নামের তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ- ২ : কালানুসারী ভারত উপমহাদেশের সভ্যতাগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ- ৩ : কালানুসারী প্রাচীন রাজবংশগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর।

প্রাচীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়জীবন প্রভৃতি সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। সীমিত সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায় মাত্র। আমরা পরবর্তী পাঠগুলোতে প্রাচীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়জীবন সম্পর্কে জানব।

পাঠ- ৬ : প্রাচীন বাংলাদেশের গৌরব : সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম

কৃষি : প্রাচীনযুগে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। এ সময় কৃষিতে উদ্বৃত্ত ছিল। ধান ছিল প্রধান ফসল। প্রচুর আখও উৎপাদন হতো। আখ থেকে উৎপাদিত গুড় ও চিনির খ্যাতি ছিল। এই গুড় ও চিনি বিদেশে রপ্তানি হতো। তুলা, সরিষা ও পান চাষের জন্যও বাংলাদেশের খ্যাতি ছিল। নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, কলা, ডুমুর প্রভৃতি ফলের কথাও জানা যায়।

কুটিরশিল্প : প্রাচীনযুগ থেকেই বাংলাদেশের তাঁতিরা মিহি সুতি ও রেশমি কাপড় বুনতে পারদর্শী ছিল। আমরা জানি বাংলাদেশের মসলিন কাপড় পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। এই মসলিন তখনও রপ্তানি হতো। এ ছাড়াও তখন উন্নতমানের মৃৎপাত্র, ধাতবপাত্র ও অলংকার নির্মাণ হতো। পোড়ামাটি, ধাতব ও পাথরের ভাস্কর্য ও মূর্তি ছিল প্রশংসনীয় শিল্প। ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা, স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাচের পুঁতিও তৈরি হতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : কৃষিতে উদ্বৃত্ত হওয়ায় এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে। নদীর তীরগুলোতে গড়ে উঠেছিল হাট-বাজার ও গঞ্জ। ব্যবসা-বাণিজ্য নদীপথেই হতো বেশি। উয়ারী-বটেশ্বর ও পুণ্ড্রনগর (মহাস্থানগড়) ছিল সমৃদ্ধ নদীবন্দর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দর ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে যেত তৎকালীন বাংলাদেশের পণ্য। অষ্টম শতকে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে এদেশের পণ্য আরবে যেত।

ধর্মমত ও সম্প্রদায় : অনুমিত হয় প্রস্তর যুগে বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির পূজা করত। ঐতিহাসিক যুগে ভারত উপমহাদেশের মতো বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আজীবক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশে জৈন ধর্মও প্রচলিত ছিল। তবে দীর্ঘসময় বৌদ্ধ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। পাল সম্রাটগণ ছিল বৌদ্ধ কিন্তু প্রজাদের অধিকাংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের। সম্রাট ধর্মপাল ধর্মীয় সম্প্রীতির নীতি গ্রহণ করেছিলেন। রাজকীয় উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত দেখা যায় ব্রাহ্মণ্যদের। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পরিবার তিন পুরুষ ধরে পাল শাসনের সঙ্গে জড়িত ছিল। তৎকালীন একাধিক তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণ্য মন্দির নির্মাণে ভূমিদানের কথা জানা যায়। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। ধর্মীয় সম্প্রীতি পাল যুগের সমাজ জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। আজও বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান দেখা যায়।

কাজ - ১ : বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ - ২ : বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষের ধর্মমতের তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৭ : প্রাচীন বাংলাদেশের গৌরব : বিনোদন সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

বিনোদন সংস্কৃতি : প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে বিনোদন ও ধর্মকর্মের অংশ হিসাবে নাচ, গান, নাটক, মল্লযুদ্ধ ও কুস্তি খেলার প্রচলন ছিল। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মন্দিরের সেবাদাসীদের সকলকেই নৃত্য-গীত-বাদ্য পটিয়সী হতে হতো। পোড়ামাটির ফলকে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দেখা যায়।

স্থাপত্য : উয়ারী-বটেশ্বর ও পুণ্ড্রনগরে ইট-নির্মিত স্থাপত্য আবিষ্কার হয়েছে। বাংলাদেশ স্থাপত্যশিল্পে উৎকর্ষ অর্জন করে পাল শাসনামলে। কথিত আছে, সম্রাট ধর্মপাল একাই ৫০টি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। অষ্টম- নবম শতকে নির্মিত তাঁর অমর স্থাপত্যকীর্তি নওগাঁ জেলার সোমপুর মহাবিহার (পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার)। পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার সোমপুর মহাবিহার ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়া ও মিয়ানমারে সোমপুর মহাবিহারের পরিকল্পনা অনুকরণ করে বৌদ্ধ স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছে। ময়নামতির শালবন বিহার এবং সম্প্রতি আবিষ্কৃত বিক্রমপুরের স্থাপত্যসমূহ বাংলাদেশের স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

সোমপুর মহাবিহার, নওগাঁ

শালবন বিহার, ময়নামতি, কুমিল্লা

ভাস্কর্য ও মূর্তি শিল্প : উয়ারী-বটেশ্বর, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত পোড়ামাটি, পাথর ও ধাতব ভাস্কর্য ও মূর্তি শিল্প উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। গুপ্ত ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতায় এ শিল্পে এক নতুন মাত্রা যোগ করে পাল ভাস্কররা, যা পাল ভাস্কর্য শিল্প নামে পরিচিত। বাংলাদেশের ভাস্কর্য শিল্প স্থান করে নিয়েছিল সর্বভারতীয় শিল্পকলার আসরে। পাল যুগের দুই বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী ধীমানপাল ও বীটপাল সুখ্যাতি অর্জন করেন। সেনযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন শূলপাণি।

চিত্রশিল্প : বৌদ্ধধর্মের পাণ্ডুলিপিতে বৌদ্ধ দেব-দেবীর রূপ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো। এখন পর্যন্ত দশম থেকে দ্বাদশ শতকের চব্বিশটি চিত্রিত বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। প্রজ্ঞাপারমিতা, অষ্টসাহস্রিকা প্রভৃতি পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলো গুণগত মানে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষের কথাই প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে চতুর্দশ শতকে নেপাল ও তিব্বতের চিত্রকলায় পাল যুগের চিত্রশিল্পের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সম্প্রতি আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র, স্বল্প-মূল্যবান পাথরের পুঁতি ও কাচের পুঁতিতে চিত্রশিল্পের ব্যবহার দেখা গেছে।

কাজ - ১ : দলে ভাগ হয়ে বাংলাদেশের প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্যের তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ - ২ : প্রাচীন বাংলাদেশের বিনোদনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৮ : প্রাচীন বাংলাদেশের গৌরব : ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা

ভাষা ও সাহিত্য : মহাস্থানগড়ে (পুণ্ড্রনগর) পাথরে খোদিত একটি লিপি পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা লিপিটির সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক। পাল ও সেন যুগের শাসকরা নিজেরাও পণ্ডিত ছিলেন এবং সাহিত্য চর্চা করতেন। তাদের সভাকবিও ছিল।

পালযুগের তাম্রশাসনে বিধৃত 'প্রশস্তি' অংশে সংস্কৃত ভাষা চর্চার শৈল্পিক মানসম্পন্ন কাব্য রচনার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' পাল যুগের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। পাল আমলে রচনা করা হয় চর্যাপদ। চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃত।

সেন রাজাগণ রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি নিজেরাও বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্য রচনা করতেন। পণ্ডিতদের সাহিত্য রচনায়ও উদ্বুদ্ধ করতেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' রাজা বল্লাল সেনের রচনা। লক্ষণ সেন পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। পিতা বল্লাল সেনের অসমাপ্ত 'অদ্ভুতসাগর' তিনি সমাপ্ত করেন। সেনদের রাজসভায় পণ্ডিত, জ্ঞানী ও কবিদের সমাবেশ ঘটেছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও কবীন্দ্র ধোয়ারির 'পবনদূত' কাব্য অমর সাহিত্যকর্ম। মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে থাকা কবিতা সেন যুগের শেষ দিকে শ্রীধর দাস সংকলন করে নাম দেন 'সদুক্তিকর্ণামৃত'।

শিক্ষা : পাল যুগের আগে বাংলাদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে খুব বেশি জানা যায় না। তবে পাল যুগে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দেখে অনুমান করা যায় মৌর্য ও গুপ্ত যুগেও শিক্ষার প্রচলন ছিল। বাংলাদেশে পাল যুগের অনেক বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কার হয়েছে। বিহারগুলো ছিল এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বিশেষ করে বৌদ্ধ ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করত। এখানকার শিক্ষকদের বলা হতো আচার্য বা ভিক্ষু। আর শিক্ষার্থীদের বলা হতো শ্রমণ। বর্তমান যুগের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিহারেও ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল তিন ধরনের। যেমন- গুরুগৃহ, চতুষ্পাঠী এবং পাঠশালা। রাজা, মন্ত্রী বা অভিজাত পরিবারের ছেলেরা গুরুগৃহে পড়ার সুযোগ পেতো। গুরু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বনের মধ্যে কুটির বানিয়ে থাকতেন। তাঁর কাছে রেখে আসা হতো ছাত্রদের। ছাত্ররা গুরুর বাড়িতেই থাকত এবং গুরুর কাছে পড়াশোনা করত। চতুষ্পাঠীতে পড়তে পারত কেবল ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলেমেয়েরা। এখানে সংস্কৃত ভাষা শেখানো হতো, যাতে টোলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। হিন্দুদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বলা হতো টোল। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ টোলের প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল।

ইউরোপের দেশগুলোতে বারো-তেরো শতকে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে। যেমন- ইতালির বোলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ডের ক্যাম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। অথচ অষ্টম শতকের মধ্যেই বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে অনেক বড় বড় বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছিল। এসব বিহারে শুধু ধর্মীয় বই পড়ানো হতো তা নয়-এখানে চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্রসহ নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে ছিল।

কাজ - ১ : প্রাচীন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গর্ববোধ করার কারণ দলগতভাবে যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন কর।
কাজ - ২ : পাল ও সেন যুগের সাহিত্যকর্মগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৯ : মধ্যযুগে বাংলাদেশ

মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে মধ্যযুগের সূচনা হয়। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন তুর্কি মুসলমান সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি। বাংলাদেশে শুরু হয় মুসলিম শাসন। পর্যায়ক্রমে তুর্কি মুসলমান সেনাপতিরা সারা বাংলাদেশে মুসলিম শাসন বিস্তার করতে থাকেন। এর আগেই ভারতে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিল্লি ছিল তাদের রাজধানী। দিল্লির সুলতানদের পাঠানো সেনাপতিরাই বাংলাদেশে প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করতেন। দিল্লি থেকে বাংলাদেশের দূরত্ব অনেক। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। ধন-সম্পদে ভরা দেশটিতে দিল্লির সুলতানের অধীনে প্রশাসক হয়ে না থেকে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনার ইচ্ছায় শাসকেরা দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। এ খবর দিল্লিতে গেলে বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য সৈন্য পাঠানো হতো। এভাবে কখনো পরাজয়ের কখনো জয়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে একসময় পুরো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এই স্বাধীনতা টিকে থাকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইলিয়াস শাহী এবং হোসেন শাহী নামক দুটি শাসক পরিবার স্বাধীনভাবে এ দুশো বছর বাংলাদেশ শাসন করে। এর মধ্যে ১৫২৬ খ্রিষ্টব্দে দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান হয়। তখন ভারত দখল করে নিয়েছিল আরেকটি মুসলমান শক্তি। তাঁরা মোগল নামে পরিচিত। এভাবে দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতে মোগল বংশের শাসন শুরু হয়। শুরু থেকেই বাংলাদেশকে দখলে রাখার চেষ্টা করেছে মোগলরা। তবে সফল হয় নি। আফগান বংশের মুসলমান শাসকরা কিছুকাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখেন।

এ সময় বিহার অঞ্চলে আফগানদের জমিদারি ছিল। আফগানদের বিখ্যাত নেতা শেরখান শূর মোগলদের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেন। এভাবে বাংলাদেশে স্বাধীন আফগান শাসন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সম্রাট আকবরও আমাদের এই বাংলাদেশ দখল করতে পারেন নি।

বাংলাদেশের বড় বড় জমিদারদের বলা হতো বারোভূঁইয়া। এই বারোভূঁইয়ারা একজোট হয়ে মোগলদের হাত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ মোগলদের অধীনে আসে। স্বাধীনতা হারিয়ে এবার বাংলাদেশ মোগলদের অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এদেশে পরোক্ষভাবে মোগল শাসন চলে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুলতানি থেকে মোগল পর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলমানদের শাসনকাল মধ্যযুগ নামে পরিচিত।

কাজ : মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের রাজবংশগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-১০ : আধুনিক যুগে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই ভারত উপমহাদেশের অংশ। মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসে ইংরেজরা। মোগল যুগ থেকেই ইউরোপের বনিক গোষ্ঠী এই উপমহাদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসতে শুরু করে। ইংরেজ বণিকরা এক সময়ে সুযোগ পেয়ে ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন চলে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুইশ বছর। প্রথম দিকে শাসন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামের একটি বণিক প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া। রানির পক্ষ থেকে ইংরেজ শাসকরা ভারত উপমহাদেশ শাসন করতেন। এই বিদেশি শাসনকে মেনে নিতে পারে নি বাংলাদেশের মানুষ। তাই তারা বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যায়। এ সময় জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পাকিস্তান ছিল দুইটি ভিন্ন অঞ্চল নিয়ে একটি ভৌগলিক ভাবে বিভক্ত বেমানান রাষ্ট্র। পশ্চিম অংশটিকে বলা হতো পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব অংশটিকে বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান।

পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকদের হাতে। তারা নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে শোষণ করত। তাই অধিকার আদায়ের জন্য বাঙালি একত্রিত হয়। সংগ্রাম করতে থাকে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে। অবশেষে ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাঙালি অর্জন করে স্বাধীনতা। জন্ম হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের।

কাজ : আধুনিক যুগে বাংলাদেশ কাদের দ্বারা শাসিত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।